The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ভট্টিকাব্যে প্রকৃতিচিত্রণ এবং মানবজীবনে তার প্রতিফলন

[The Portrayal of Nature in Bhattikavya and Its Impact on Human Life]

Tanzila Akter Eva
Lecturer, Department of Sanskrit, University of Dhaka, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 26 February 2025
Received in revised: 20 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Portrayal, Nature, Bhattikavya, Impact, Human Life.

ABSTRACT

Nature is an important part in Sanskrit literature. It is very much seen from the Veda to classical period. In creating their literary works the Sanskrit writers have used nature greatly and profoundly. In Bhattikavyam also the poet Bhatti or Bhartrihari has used nature in various ways. The diversity of nature has come out as gentle and dreadful appearace in his Kavya. And relevantly the impact of nature is shown on human life. Bhattikavyam is actually created based on the Ramayana-story. The poet has shown his powerful imagination in narrating the most popular and welknown story of the Ramayana where nature has a big role to attaract the narration and its impact on human life. In this article the portrayal of nature in Bhattikavyam and its impact on human life will be discussed thoroughly and vividly.

ভর্তৃহরি বিরচিত বাইশ সর্গে বিভাজিত ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তু বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ থেকে গৃহীত। রামায়ণ সাত কাণ্ডে বিভক্ত মহাকাব্য। রামের জীবনী তার মূল উপজীব্য। আদিকাণ্ডে নারদ-বাল্মীকি সংবাদ দিয়ে যে মহাকাব্যের শুরু তা শেষ হয়েছে উত্তরকাণ্ডের রামায়ণমাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে রামায়ণের আদিকাণ্ডে রামচন্দ্রের পিতার বর্ণনা থেকে শুরু করে যুদ্ধকাণ্ডের শেষাংশ পর্যন্ত কাহিনি থেকে ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তু গৃহীত। রাম কর্তৃক রাবণকে বধই এর মূল উপজীব্য। এজন্য এর আর এক নাম রাবণবধ। রামের জন্ম থেকে এ মহাকাব্যের শুরু। রাম কর্তৃক মারীচ বধ, রাম-সীতার প্রণয়, বনবাসের সময় রাবণকর্তৃক সীতা- হরণ, হনুমান-সুগ্রীবের সহায়তায় সীতা- উদ্ধার ও রাবণকে হত্যা করে বিভীষণকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা এবং সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় এসে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন প্রভৃতি রামায়ণের প্রায় সব ঘটনার বর্ণনা এসেছে এ মহাকাব্যে। আর এই বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য, বিভিন্ন পর্বতের প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্ররূপের বর্ণনা করেছেন কবি।

ভর্তৃহরি মূলত কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে ভট্টিকাব্য রচনা করলেও এতে সজীবতার স্পর্শের অভাব নেই। এই কাব্যের বিভিন্ন সর্গে তিনি পরিবেশ- প্রকৃতির যে মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী। তাঁর শব্দচয়ন, অলংকার, ছন্দ প্রয়োগের শৈল্পিক পরিবেশনে পরিবেশ-প্রকৃতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে যেকোনো কাব্যরসিক সংবেদী জনের কাছে এ কাব্য নীরস কাব্য মনে হবে না। এ কাব্যে তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের যেমন শান্তরূপ তুলে ধরেছেন ঠিক তেমনি এর রুদ্ররূপও উন্মোচিত করেছেন।

কবি ভট্টিকাব্যে ঋতু-বৈচিত্র্যে পরিবেশের রূপসজ্জার যে পরিবর্তন তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। বর্ষা ঋতুতে মেঘের এবং জল বর্ষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন–

তর্পণং প্রজনিষ্ণুনাং শস্যানামমলং পয়ঃ।
রোচিষ্ণবঃ সবিস্ফূর্জা মুমুচুর্ভিন্নবদ্‌ঘনাঃ ॥

নিরাকরিষ্ণবো ভানুং দিবং বর্তিষ্ণবোঽভিতঃ।
অলঙ্করিষ্ণবো ভান্তস্তরিড়ত্বন্তশ্চরিষ্ণবঃ ॥
ভট্টিকাব্যম্‌, ৭/২-৩

– দীপ্ত মেঘমালা বজ্রের ধ্বনিতে ভরা সেই মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন হয়েই যেন উৎপন্ন শস্যের পক্ষে তৃপ্তিকর নির্মল জল বর্ষণ করতে লাগল; ঐ মেঘজাল সূর্যকে ঢেকে ফেলল, আকাশের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে বিদ্যুৎ মালায় বেষ্টিত হয়ে শোভা পেতে লাগল।

বর্ষা ঋতু প্রকৃতিতে আসে আলাদা সৌন্দর্য নিয়ে। গ্রীষ্মের শুষ্কতা- রুক্ষতাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে দেয়। প্রকৃতি হয় সুন্দর নির্মল। ফসল, গাছপালা নতুন জলে অবগাহন করে নিজেদের সুন্দর করে তোলে।

বর্ষাকে বলা হয় বিরহের ঋতু। প্রেমিক-প্রেমিকা এসময় একে অন্যের সঙ্গ কামনা করে। কাছে না থাকলে বিরহকাতর হয়ে পড়ে। এ অবস্থা আমরা দেখতে পাই রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে। সীতা কাছে নেই। তাই তার জন্য তিনি দুঃখকাতর, উন্মত্তপ্রায়। কবির ভাষায়–

তান্ বিলোক্যাসহিষ্ণুঃ সন্ বিললাপোন্মাদিষ্ণুবৎ।
বসন্ মাল্যবতি গ্লাস্নু রামো জিষ্ণুরধৃষ্ণুবৎ।
ভট্টিকাব্যম্, ৭/৪

– রাম মাল্যবান্ পর্বত থেকে ঐ মেঘ অবলোকন করে জয়শীল হয়েও অস্থির ব্যক্তির ন্যায় অসহিষ্ণু এবং গ্লানিযুক্ত হয়ে উন্মাদের ন্যায় বিলাপ করতে লাগলেন।

এখানে রামচন্দ্রের যে বিরহদশা আমরা দেখতে পাই তা প্রত্যেক প্রেমিক পুরুষের বিরহদশার প্রতিনিধিত্ব করে।

এ সময় বহমান স্নিগ্ধ ও শীতল বাতাসে পাওয়া যায় কদমফুলের সুঘ্রাণ; যা সবাইকে বিমোহিত করে। চাতকেরা জলের দেখা পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে, সর্বত্র সঞ্চরণশীল বিদ্যুতের খেলা দেখে মন ভালো হয়ে যায়। বর্ষার আগমনে ময়ূর তার পেখম মেলে নাচতে শুরু করে। এ ঋতু কঠিন হৃদয়ের মানুষকেও মুগ্ধ করে–

কুর্যাদ্‌যোগিনমপ্যেষ স্ফূর্জাবান্ পরিমোহিণম্।
ত্যাগিনং সুখদুঃখস্য পরিক্ষেপ্যম্ভসামৃতুঃ।
ভট্টিকাব্যম্, ৭/১০

– এই বজ্রধ্বনিময় জলবর্ষণকারী ঋতু সুখদুঃখ বর্জনকারী যোগিজনের চিত্তকেও বিমোহিত করে তোলে।

প্রকৃতির বৈচিত্র্য মানুষের মনকে যে পরিবর্তন করে দেয় এ শ্লোক তার একটা অনুপম দৃষ্টান্ত।

বর্ষায় প্রকৃতি একরূপে ধরা দেয় তো শরতে তার আর এক রূপ। ভট্টিকাব্যে অযোধ্যা পুরীর বাইরে তরুরাজি, সরোবর, নদী ও দিকসমূহের সৌন্দর্য দেখে শরৎ সমাগমের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অপূর্ব। শুধু পদ্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের পদ্মের কথা উল্লেখ করেছেন। কবির ভাষায়

তরঙ্গসঙ্গাচ্চপলৈঃ পলাশৈ–
র্জ্বালাশ্রিয়মং সাতিশয়াং দধন্তি।
সধূমদীপ্তাগ্নিরুচীনি রেজু-
স্তাম্রোৎপলান্যাকুলষট্‌পদানি।
বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং
নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ
সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ।
ভট্টিকাব্যম্, ২/২-৩

– তরঙ্গের আঘাতে রক্তোৎপলের দলগুলি চঞ্চল তাই ভ্রমরের দল তাদের উপর বসতে পারছে না, শুধু উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, রক্তপদ্মগুলি যেন ধূমাচ্ছন্ন প্রজ্বলিত অগ্নি, পদ্মপলাশ যেন অগ্নিশিখা, ভ্রমরপুঞ্জ যেন ধোঁয়া। তীরস্থ বনরাজির প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে জলে, তীর ভাবল জল তার শোভা হরণ করছে, অধৈর্য হয়েই যেন সে স্থলপদ্মের শোভা বিস্তার করল।

এ কেবল মহাকবি ভর্তৃহরির প্রকৃতির মহাকাব্যিক বর্ণনা নয়, এ যেন কোনো চিত্রশিল্পী তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এঁকেছেন। প্রকৃতির এক সুন্দর ছবি অলঙ্কৃত শব্দরাশি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কবি। উপমা অলঙ্কার ব্যবহার করে শান্ত শরতের অনন্য চিত্র অঙ্কন করেছেন তিনি। প্রকৃতির এ ছবিখানা খুব জীবন্ত। তরঙ্গের আঘাতে রক্তপদ্ম, তার উপর ভ্রমরদলের উড়ে বেড়ানো, নদীতীরস্থ বনরাজির নয়নভুলানো রূপ ভর্তৃহরির প্রকৃতির এই ছবি যেন কথা বলে যায়।

শরতের সকাল কতটা মোহনীয় রূপে ধরা দেয় তার উল্লেখ রয়েছে ভট্টিকাব্যে। সকালের পরিবেশের বর্ণনায় বলা হয়েছে-

নিশাতুষারৈর্নয়নাম্বুকল্পৈঃ
পত্রান্তপর্য্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ।
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ
কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ।
ভট্টিকাব্যম্, ২/৪

– প্রভাতে তীরে অবস্থিত গাছে পাখিরা করছে কূজন, পাতা থেকে ঝরছে শিশিরবিন্দু। ওদিকে চাঁদের বিরহে বিরহিণী যেন পদ্ম। যেন তীরস্থিত তরু পথের প্রতি সমবেদনায় ক্রন্দনরত, শিশিরবিন্দু তার অশ্রুধারা।

কবির কী অসাধারণ কল্পনা! কবির কল্পনায় চাঁদ, পদ্মফুল, তীরস্থিত তরু সকলেই পরস্পর বন্ধু, বড়ো আপন। এখানে চাঁদের বিরহী পদ্ম আর পদ্মের দুঃখ দেখে কাঁদছে তীরস্থিত তরু।

প্রকৃতিতে উপস্থিত উপাদানের একে অন্যের সাথে ছিল নিবিড় সম্পর্ক, যা প্রকৃতিকে দিয়েছে শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ-

বনানিতোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মীম্
আলোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ॥
ভট্টিকাব্যম্, ২/৫

– বনরাজি ভ্রমরযুক্ত নয়নতুল্য পুষ্পের দ্বারা এবং জলরাশি ভ্রমরশোভিত নয়নতুল্য পদ্মের দ্বারা যেন বিস্মিত হয়েই পরস্পরের শোভা দেখছিল।

শরৎ প্রকৃতিতে অন্য রূপ নিয়ে আসে। পদ্মফুলে শোভিত হয় সরোবর, নির্মল আকাশ, গাছে গাছে ভ্রমরযুক্ত পুষ্প। প্রকৃতির এ নতুন শোভা মানুষের মনকে বিমোহিত করে।

কোনো স্ত্রী কখনোই তার স্বামীর অন্য কোনো নারীর সাথে সম্পর্ক মানতে পারে না এটিও প্রকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে–

প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্॥
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশং সহতেহন্যসঙ্গমম্॥
ভট্টিকাব্যম্, ২/৬

– প্রভাত সমীরণের আঘাতে পদ্মিনী কাঁপছিল; ক্রুদ্ধা পদ্মিনী যেন ভ্রমরকে তার উপর বসতে নিষেধ করছে, ভ্রমরের দেহ যে কুমুদিনীর পিঙ্গল (হলুদ আভাযুক্ত নীলবর্ণ) রেণুতে রঞ্জিত। মানিনী স্ত্রী কখনও পতির অন্য নারীসংসর্গ সহ্য করতে পারে না।

বর্তমানে কিংবা অতীতে কোনো সময়ই স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি। প্রকৃতি ও প্রাণীর আচরণের মধ্য দিয়ে সেই বিষয়টি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন কবি।

এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ব্যাধও তার লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। হংসের ধ্বনি শুনে সে তার একাগ্রতা ধরে রাখতে পারছে না। পরিবেশের রমণীয় শোভা একজনকে কতটা মুগ্ধ করতে পারে তা রামচন্দ্রের অবস্থা দেখলে বুঝতে পারা যায় –

লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্ণাৎ
স নদ্যবস্কন্দমুপাস্পৃশচ্চ।
কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং
কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত॥
ভট্টিকাব্যম্, ২/১১

– রামচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে প্রত্যেকটি লতা নত করে বার বার পুষ্প চয়ন করতে লাগলেন, প্রত্যেক নদীর নিকটে বারবার গিয়ে মুখে জল দিলেন, প্রত্যেক শিলাতলে বার বার উপবেশন করে হাসিমুখে বসতে লাগলেন।

প্রকৃতি স্নিগ্ধ-কোমল-রূপে রামচন্দ্রের মতো ব্যক্তিকেও মোহিত করতে পারে তা এ শ্লোক থেকে বুঝতে পারা যায়।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শান্ত যে মোহনীয় রূপ আমরা ভট্টিকাব্যে দেখতে পাই তাতে প্রকৃতির জড় উপাদানের সাথে জীবন্ত উপাদান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কুন্দ ফুলের মতো শুভ্রবর্ণ হংসশ্রেণী শ্বেতবর্ণের পদ্মের সাথে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাদের কলনিনাদ শুনেই বোঝা যাচ্ছে এখানে তারা অবস্থান করছে।

একাবলী অলংকার প্রয়োগ করে চমৎকার একটি শ্লোকের অবতরণা করেছেন কবি প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ বোঝাতে–

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্পদম্।
ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মন॥
ভট্টিকাব্যম্, ২/১৯

– সেথায় এমন জলই ছিল না যাতে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়নি, তেমন পদ্মই ছিল না যাতে মধুকর মধুপানে উন্মত্ত হয় নি, সে মধুকরই ছিল না যে মধুর গুঞ্জন করেনি, সেই গুঞ্জন হয়নি, যা লোকের মন হরণ করেনি।

পদ্মশোভিত সরোবর সবসময়ই মানুষকে বিমোহিত করে। পদ্মের ওপর মধুর লোভে বসে ভ্রমর যে গুঞ্জন করে তা চিত্তাকর্ষক।

এখানকার শস্যক্ষেত্রের, গোচারণভূমির, মৃগদলের সৌন্দর্য প্রকৃতিকে করে তুলে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত। এসব গ্রামীণ পরিবেশ রামচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। বিশ্বামিত্রের সাথে রাক্ষসবধের জন্য তিনি তপোবনে গিয়েছিলেন। এই তপোবনের পরিবেশ কতটা শান্ত-স্নিগ্ধ ও কোমল হতে পারে তা উঠে এসেছে ভট্টিকাব্যে –

ক্ষুদ্রান্ ন জক্ষুর্হরিণান্ মৃগেন্দ্রা
বিশশ্বসে পক্ষিগণৈঃ সমন্তাৎ।
নংনম্যমানাঃ ফলদিৎসয়েব
চকাশিরে তত্র লতা বিলোলাঃ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ২/২৫

– সেই তপোবনে পশুরাজগণ হরিণদের শিকার করত না, পাখিরা সর্বত্র বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করত, লতাগুলিও যেন ফলদানের ইচ্ছায় অত্যন্ত নত হয়ে শোভা পেত।

এখানে তপোবনের শান্ত প্রকৃতির রূপ দেখে উৎফুল্ল হয় মন। যেখানে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই। গাছপালা, পশুপাখি সকল প্রকৃতি যেন অপরের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

পরবর্তীতে রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যান, তখন তিনি বিভিন্ন মুনির আশ্রমে গিয়েছেন। তিনি অত্রি মুনির তপোবন থেকে শরভঙ্গমুনির নিকটবর্তী সুতীক্ষ্মমুনির আশ্রমে যান। এরপরে অন্যান্য মুনির আশ্রমেও ভ্রমণ করতে থাকেন। এ সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

বনেষু বাসতেয়েষু নিবসন্ পর্ণসংস্তরঃ।
শয্যোত্থায়ং মৃগান্ বিধ্যন্নাতিথেয়ো বিচক্রমে ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৪/৮

– বাসযোগ্য বনে বনে রামচন্দ্র পর্ণশয্যায় শুয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। অতিথি পূজা করবার জন্য তিনি শয্যা ত্যাগ করেই পশু শিকার করে বিচরণ করতেন।

তপোবন সবসময় নগরজীবন থেকে আলাদা। এখানে ভোগ-বিলাসের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়।

শান্ত স্নিগ্ধ তপোবনে ব্রাহ্মণেরা যে খুব নিরাপদ ছিলেন তাও নয়। রাক্ষসের দল বিভিন্ন সময় অতর্কিত হামলা করে তাদের জান-মালের ক্ষতি করত। তাইতো বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এনে অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। রামচন্দ্রও রাক্ষসদের বধ করলেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন–

তং বিপ্রদর্শং কৃতঘাতযত্না
যান্তং বনে রাত্রিচরী ডুঢৌকে।
জিঘাংসুবেদং ধৃতভাসুরাস্তাং-
তাড়কাখ্যাং নিজঘান রামঃ ॥
ভট্টিকাব্যম্,২/২৩

– ব্রাহ্মণ দেখামাত্র তার নিধন সাধনে যত্নবান তাড়কা নাম্নী রাক্ষসী, রামচন্দ্রকে তপোবনাভিমুখে যেতে দেখে সামনে আসলেন; রামও রাক্ষসীকে মারবার অভিপ্রায়ে আসছে বুঝতে পেরে, তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তার প্রাণ নিলেন।

ভট্টিকাব্যে প্রকৃতির শান্ত ও ভয়ংকর রূপের এক বিস্ময়কর সমন্বয় দেখা যায়। তপোবনের শান্ত সমাহিত কল্যাণ রূপ যা সকল প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়। আবার দণ্ডকারণ্যের ভীষণরূপের রহস্যময়তায় জড়িয়ে আছে ভয়-ভীতি শঙ্কা -

রামোঽপি হতমারীচো নিবর্তস্যন্ খরনাদিনঃ।
ক্রোষ্টুন্ সমশৃণোৎ ক্রূরান্ রসতোঽশুভশংসিনঃ ॥
আশঙ্কমানো বৈদেহীং খাদিতাং মৃতাম্।
স শত্রুঘ্নস্য সোদর্য্যমারাদায়ান্তমৈক্ষত ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৬/৫-৬

– এদিকে রামচন্দ্র মারীচকে নিহত করে যখন ফিরে আসছেন তখন শুনলেন শৃগালের দল উচ্চস্বরে ভীষণ চীৎকার করে অশুভ সূচনা করছে। হয়তো সীতাকে খেয়ে ফেলেছে অথবা নিহত করেছে অথবা নিজেই মরেছে এই রকম আশঙ্কা করতে করতে তিনি দূর হতে দেখলেন, শত্রুঘ্ন সহোদর লক্ষ্মণ আসছে।

তপোবন শুধু শান্ত-স্নিগ্ধ রূপে থাকতো না। এখানে ভয়ংকর রাক্ষস-রাক্ষসী, প্রাণী আর জীবজন্তুর বসবাস ছিল। সুযোগ পেলেই তারা হিংস্র হয়ে উঠত। তাদেরকে দমন করার জন্যও মাঝে মাঝে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হতো।

ভরত রামচন্দ্রের খোঁজে যখন বনে গমন করেন, সেই পথযাত্রায় উঠে এসেছে অনেক নদীর নাম। তমসা নদী, মন্দাকিনী নদী তীরের রমণীয় বর্ণনা উঠে এসেছে কবির বর্ণনায়। কবির ভাষায় –

সম্প্রাপ্য তীরং তমসাপগায়া
গঙ্গাম্বুসম্পর্কবিশুদ্ধিভাজঃ
বিগাহিতুং যামুনমম্বু পুণ্যং
যযুর্নিরুদ্ধশ্রমবৃত্তয়স্তে ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৩/৩৯

– তাঁরা তমসানদীর তীরে উপস্থিত হলেন; এই তীরভূমি গঙ্গাজলের স্পর্শে অতি পবিত্র। তাঁরা পরিশ্রমের কাজ স্থগিত রেখে যমুনার পুণ্য জলে অবগাহন করতে গেলেন।

সীতা অন্বেষণে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরের নিকট বনে বনে গমন করেছেন। পম্পা সরোবরের নিকটবর্তী বনরাজিকে রাম মদনমন্দিরের সাথে তুলনা করেছেন। হংস ও কোকিলের সুমধুর শব্দও তার কাছে কটু লাগছে প্রিয়াবিরহে। পাখির কূজন, বার বার মধুপান, পুষ্পগন্ধের ঘ্রাণ নেওয়া, সীতা বিরহে থাকা রামকে করেছে আরও চঞ্চল। পম্পা সরোবরের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন-

ভৃঙ্গালীকোকিলক্রুঙ্ভির্বাশনৈঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
রোচনৈর্ভূষিতাং পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিধম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৬/৭৪

– লক্ষ্মণ, ঐ দেখ আমাদের হৃদয়ভেদী পম্পা সরোবরের শোভা; যা শব্দায়মান ভ্রমরশ্রেণী, কোকিল ও ক্রৌঞ্চের দ্বারা শোভিত।

প্রকৃতি মানবমনে প্রবল প্রভাব ফেলে। দুঃখের সময় প্রকৃতির মোহনীয় রূপ দেখে বিরহী মন আরও কাতর হয়ে ওঠে।

ভট্টিকাব্যে বেশ কিছু পর্বতের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে পরিবেশ-প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও ভয়ংকর দুটি দিকই ফুটে উঠেছে। পর্বতের বৃক্ষগুলি বাতাসের দ্বারা ভ্রমণশীল সুরাপায়ীদের মতো দেখাচ্ছে। আবার এ পর্বতেই বাস করে নিষ্ঠুর ও হিংস্র জন্তু। গুহায় থাকে রাক্ষস, যারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। এখানকার গিরিপথও চলাচলের জন্য খুব একটা ভালো নয়।

হনুমান সীতা অন্বেষণে লঙ্কা যাওয়ার পথে মৈনাক পর্বতে যান। মৈনাক পর্বত তার সাথে দেখা করার জন্যই সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছিল। মৈনাক পর্বত তার সুন্দর বনগুলিতে হনুমানকে বিচরণ করতে বলেন –

ফলান্যাদৎসু চিত্রাণি
পরিক্রীড়স্ব সানুষু।
সাধ্বনুক্রীড়মানানাং
পশ্যন্ বৃন্দানি পক্ষিণাম্।
ভট্টিকাব্যম্, ৮/১০

– তুমি এখানে বিচিত্র ফল গ্রহণ করো, ক্রীড়ামত্ত পাখিদের দেখতে দেখতে সানুদেশে ইচ্ছেমতো বিহার করো।

সুবেল পর্বত তরুমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত। সুবেল পর্বতের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন –

সরসবহুপল্লবাবিল-কেসরহিন্তালবদ্ধবহলচ্ছায়ম্।
ঐরাবণমদ পরিমল গন্ধবহাবদ্ধদন্তি-সংরম্ভরসম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১৩/৩৩

– সেই পর্বত বহু সরস পত্রপল্লবযুক্ত কেসর ও হিন্তালতরুর ঘনচ্ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকত এবং ঐরাবতমদগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হয়ে অন্য হস্তিগণের ক্রোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করত।

বনে ছিল বরাহ, গাভী, সারঙ্গ, বিভিন্ন প্রকার সর্প। বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে স্থলপদ্ম, দাড়িম্বতরু, মন্দারতরু, শাল, বিভিন্ন ফলভারে অবনত তরু, নবাঙ্কুর তৃণ যা তার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে –

চলকিসলয়-সবিলাসং চারুমহীকমলরেণুপিঞ্জরবসুধম্।
সকুসুমকেসরবাণং লবঙ্গতরু-তরুণবল্লরীবরহাসম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১৩/৩৯

– সেই সুবেল যেন চঞ্চল কিশলয়রূপে হস্তের দ্বারা বিলাস বিন্যাস করত; মনোহর স্থলপদ্মের পরাগে বসুধা পীত ও রক্তবর্ণে রঞ্জিত হতো; কেশরের সঙ্গে কুসুম শররূপে গণ্য হতো এবং হাস্যরূপে প্রতিভাত হতো লবঙ্গতরুর নতুন পল্লববিকাশ।

প্রকৃতির কী অপরূপ বর্ণনা! একে অন্যের সঙ্গে কী নিবিড় সম্পর্ক!

লবণ সমুদ্রের চারপাশের পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রতীর শীতল সমীরণে মনোরম। চন্দ্রের কিরণ মানুষকে বিমোহিত করে। তীরের আশেপাশের পর্বতে রয়েছে গুহা। গুহার মধ্যে বাস করে জলহস্তী। বনে শোনা যায় সিংহের হুংকার। হাতি-হরিণের অবাধ বিচরণ। কলহংস ও সারসের বিচরণে প্রকৃতিকে আরো সুন্দর লাগছে। উজ্জ্বল ও উচ্চ তরুগণের শীতল ছায়ায় প্রাণীরা বিচরণ করে। যেখানে রয়েছে বহু সম্পদ। রামের নিক্ষিপ্ত বাণে সমুদ্রজলের প্রাণীসমূহের কী অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনায় বলা হয়েছে –

ঘোরজলদন্তিসঙ্কুলমট্টমহাপঙ্ককাহলজলাবাসম্।
আরীণং লবণজলং সমিদ্ধফলবাণবিদ্ধঘোরফণিবরম্ ॥
সভয়ং পরিহরমাণো মহাহিসঞ্চার-ভাসুরং সলিলগণম্।
আরূঢ়ো লবণজলো জলতীরং হরিবলাগম-বিলোলগুহম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১৩/৪-৫

– রামের নিক্ষিপ্ত বাণে লবণাক্ত জল সবদিকে শুকিয়ে গেল, ভয়ঙ্করদর্শন জলহস্তী, বিশাল মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তুগণ কাদায় মাখামাখি, প্রজ্বলিত বাণের অগ্রভাগে মহা সর্পগুলি বিদ্ধ হলো, সঞ্চরণশীল মহাসর্পগুলির মস্তকস্থিত মণির দীপ্তিতে উজ্জ্বল এমন জলরাশি অপসারিত করে মূর্তিমান সমুদ্র সভয়ে তীরে উঠে এলেন। তখন বানর সৈন্যের আগমনে তীরবর্তী পর্বতের গুহাগুলি আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

সমুদ্রে বাস করে বিচিত্র সব প্রাণী। সব প্রাণীকে আমরা সেভাবে চিনিও না। ক্ষিপ্ত রামচন্দ্র সমুদ্র শাসন করলে আমরা সেইসব প্রাণীর দেখা পাই।

বানরসেনারা সেতুবন্ধন করার জন্য ব্যবহার করেছিল লবণ সমুদ্রের তীরবর্তী প্রস্তর খণ্ডগুলিকে।

সীতান্বেষণে বের হয়ে বানর সৈন্যরা দুর্গমপথ পাড়ি দিয়েছে। তারা উচ্চ পর্বত এবং দুস্তর নদীগুলো পার হয়েছে সীতার অনুসন্ধানে। লঙ্কা নগরীতে প্রবেশের পথে সমুদ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

অমর্ষিতমিব ঘ্নন্তং তটাদ্রীন্ সলিলোর্ম্মিভিঃ।
শ্রিয়া সমগ্রং দ্যুতিতং মদেনেব প্রলোঠিতম্ ॥
পূতং শীতৈর্নভস্বদ্ভির্গ্রস্থিত্বেব স্থিতং রুচঃ।
গুম্ফিত্বেব নিরস্যন্তং তরঙ্গান্ সর্বতো মুহুঃ ॥
বঞ্চিত্বাপ্যম্বরং দূরং স্বস্মিং স্তিষ্ঠন্তমাত্মনি।
তৃষিত্বেবানিশং স্বাদু পিবন্তং সরিতাং পয়ঃ ॥
দ্যুতিত্বা শশিনা নক্তং রশ্মিভিঃ পরিবর্দ্ধিতম্।
মেরোর্জেতুমিবাভোগমুচ্চৈর্দিদ্যোতিষুং মুহুঃ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৭/১০৬-১০৯

– ঐ সমুদ্র যেন ক্রুদ্ধ হয়েই জলতরঙ্গে তটশৈলগুলিকে আঘাত করছে। নিজের পূর্ণশোভায় সজ্জিত হয়ে যেন মদনবেশে ঘূর্ণিত হচ্ছে। শীতলবায়ু প্রবাহে যেন পবিত্র হচ্ছে, যেন (সকল সময়) দীপ্তিতে মণ্ডিত হয়েই রয়েছে, যেন তরঙ্গরাশি একত্র করে আবার চারদিকে তাদের ছড়িয়ে দিচ্ছে, অম্বর অতিক্রম করেও সমুদ্র নিজের স্বরূপে অবস্থিত, তৃষ্ণার্ত হয়েই যেন অহর্নিশ নদীসমূহের জল পান করছে, রাত্রিতে উদিত চন্দ্রের কিরণে যেন বর্ধিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে মেরুপর্বতের উচ্চতা জয় করবার জন্য ঊর্ধ্বে নিজেকে বিস্তৃত করবার জন্য উৎসুক।

সীতান্বেষণে গিয়ে হনুমান অশোকবনে যান। সেখানকার স্নিগ্ধ পরিবেশও তাকে মুগ্ধ করে। অশোকবনের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

অবাদ্বায়ুঃ শনৈর্যস্যাং লতাং নর্তয়মানবৎ।
নায়াসয়ন্ত সন্ত্রস্তা ঋতবোঽন্যোন্যসম্পদঃ ॥
জ্যোৎস্নামৃতং শশী যস্যাং বাপীবিকসিতোৎপলাঃ।
অপায়য়ত সম্পূর্ণ ঃ সদা দশমুখাজ্ঞয়াঃ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৮/৬১-৬২

– সেখানে বায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত হচ্ছে শুধু লতাগুলিকে একটু নাচিয়ে দেওয়াই তার কাজ; সেখানে রাবণের ভয়ে ভীত হয়েই ঋতুগণ পরস্পরের সমৃদ্ধিতে বাধা দিচ্ছে না। সেখানে রাবণের আদেশে সর্বদা পূর্ণচন্দ্র পদ্মযুক্ত সরোবরগুলিকে জোৎস্নামৃত পান করাচ্ছে।

অশোকবন ধ্বংসের সময় সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

বিলুলিত পুষ্পরেণুকপিশং প্রশান্তকলিকা পলাশকুসুমম্।
কুসুমনিপাতচিত্রবসুধং সশব্দানিপতদ্দ্রুমোৎকশকুনম্ ॥
শকুননিনাদনাদিতককুব্ বিলোলবিপলায়মানহরিণম্।
হরিণ বিলোচনাধিবসতিং বভঞ্জ পবনাত্মজো রিপুবনম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৮/১৩২

– তখন হনুমান হরিণনয়না সীতার বাসভূমি সেই অশোকবন ধ্বংস করলেন। ফলে, বনফুলের পরাগে বন পিঙ্গলবর্ণ হয়ে উঠল; পত্র, কলি ও পুষ্প ছিন্নভিন্ন হলো, পুষ্পের পতনে বনতল বিচিত্র শোভা ধারণ করল। বৃক্ষরাজি সশব্দে ধূলিসাৎ হতে লাগল, বৃক্ষস্থ পক্ষীরা উড়ে গেল। তাদের কলরবে সমস্ত দিক আছন্ন হলো হরিণদল ব্যাকুলভাবে ছুটে যেতে লাগল।

যে অশোকবন নির্মাণ করা হয়েছিল আকাশ আবৃত করতে কিংবা পক্ষীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য, পবননন্দন সেই অশোকবন নির্দয়ভাবে ধ্বংস করল। যেন তিনি দয়ামায়াশূন্য। ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বধের উদ্দেশ্যে অশোকবনে আসলে পাখিরা আশ্বস্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইন্দ্রজিতের উপর নির্ভর করতে লাগল। ইন্দ্রজিতের আগমনে অশোকবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

রোদিতি স্মেব চায়াতি তস্মিন্ পক্ষিগণঃ শুচা।
মুক্তকণ্ঠং হতান্ বৃক্ষান্ বন্ধূন্ বন্ধোরিবাগমে ॥
আশ্বসীদিব চায়াতি তদ্বেগপবনাহতম্।
বিচিত্রস্তবকোদ্ভাসি বনং লুলিতপল্লবম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৯/৫৫-৫৬

– সেই ইন্দ্রজিৎ এলে পাখিরা বন্ধুর আগমনে বন্ধুজনের মতোই বিধ্বস্ত বৃক্ষগুলির জন্য শোকে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করতে লাগল। ইন্দ্রজিৎ এলে তার বায়ুবেগে আহত হয়েই যেন বনস্থলী আশ্বস্ত হলো, কারণ সেই বন বিচিত্র স্তবকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং মনোহর পল্লবে শোভিত হলো।

বন্ধুজনের আগমনে বিধ্বস্ত প্রকৃতির আশ্বস্ত হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। প্রকৃত বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলেই শত বিপদেও নিজেকে নিরাপদ মনে করা যায়।

হনুমানকে রাবণ অশোকবন ধ্বংসের জন্য শাস্তি দেন। তাঁর লেজে আগুন লাগানো হয়। ফলে লঙ্কাপুরীতে যে কলহ সৃষ্টি হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ। তিনি রাবণের কলহংসাভিরাম গৃহে অগ্নিসংযোগ করেন। লঙ্কার পরিবেশ রাক্ষস-রাক্ষসীদের চিৎকারে থমথমে হয়ে ওঠে। পাখিরা সরোবর থেকে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গেল। অগ্নির স্পর্শে স্বর্ণগৃহের স্বর্ণ গলে গলে পড়তে লাগল। হাসি আনন্দ সব থেমে গেল। কবির ভাষায়–

নিখিলাভবন্নসহসা সহসা
জ্বলনেন পূঃ প্রভবতা ভবতা।
বণিতাজনেন বিয়তা বিয়তা
ত্রিপুরাপদং নগমিতা গমিতা ॥
ভট্টিকাব্যম, ১০/৩

– উৎপন্ন অগ্নি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল, সমগ্র পুরী সহসা আনন্দহীন হলো; পুরবাসিনী রাক্ষসবনিতাগণ ভয়ে শূন্য পথে ইতস্ততঃ ছুটতে লাগল এবং ত্রিকূট পর্বতাশ্রিতা ঐ নগরী দহ্যমান ত্রিপুর-পুরীর দশাপ্রাপ্ত হলো।

এ থেকে আমরা মানুষসৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিভাবে হয়; সে বিষয়ে শিক্ষা পাই।

ভর্তৃহরি তাঁর কাব্যে মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়েও প্রকৃতিকে টেনে এনেছেন। সীতার বর্ণনায়ও উঠে এসেছে প্রকৃতির বর্ণনা–

হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা
চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা।
শশাঙ্ককান্তেরধিদেবতাকৃতিঃ
সুতা দদে তস্য সুতায় মৈথিলী ॥
ভট্টিকাব্যম্, ২/৪৭

– সীতা ছিলেন শালবৃক্ষে আশ্রিতা সঞ্চারিণী স্বর্ণলতার মতো। অন্তরীক্ষ থেকে বিচ্যুতা স্থিতিশীলা সৌদামিনীর মতো এবং চন্দ্রকান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো। এই সীতা তিনি (জনক) রামচন্দ্রকে দান করলেন।

মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিরা সবসময় উপমা-রূপক অলংকারের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে তার তুলনা টেনেছেন।

অসাধারণ কবিবর্ণনায় প্রকৃতি ও মানবীর রূপে যে কোনো পার্থক্য নেই; তা আমরা এ শ্লোকে দেখতে পাই।

অন্যদিকে হনুমানকর্তৃক রাবণের বর্ণনায়ও উঠে এসেছে পরিবেশ প্রকৃতি–

তস্মিন্ কৈলাসসঙ্কাশং
শিরঃশৃঙ্গং ভুজদ্রুমম্
অভিক্ষিপন্তমৈক্ষিষ্ট
রাবণং পর্বতশ্রিয়ম্।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৫১

– হনুমান সেখানে দেখলেন, কৈলাস পর্বতের মতো শোভমান রাবণ অন্যান্য পর্বতের শোভা অতিক্রম করে বিরাজিত। তার দুই বাহু বৃক্ষতুল্য এবং তার মস্তক যেন পর্বতের শৃঙ্গ।

কবি তাঁর কাব্যে মানুষের শোভা, সৌন্দর্য, শক্তিমাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে তার চারপাশের বৃক্ষ, চন্দ্র, পর্বতের সাথে উপমা দিয়েছেন।

চতুর্দশ সর্গে যুদ্ধের নিনাদ বেজে উঠলে পরিবেশ ধারণ করে গম্ভীররূপ। উটগুলো ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে, হরিণ ভীত হয়ে দলভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, রমণীগণ প্রিয়াবিয়োগের ভয়ে ম্লান হয়ে যায়, সৈন্যগণ যুদ্ধাস্ত্র দেখিয়ে গর্জন করতে শুরু করে। অশ্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

সমুৎপেতুঃ কষাঘাতৈরশ্যাকর্ষৈর্মমঙ্গিরে।
অশ্বাঃ প্রদুদ্রুবুর্মোক্ষে রক্তং নিজগরুঃ শ্রমে ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৪/১০

– তারপর অশ্বসমূহ কশাঘাতে লাফিয়ে উঠল, বল্গা আকর্ষণে নাসিকা কুঞ্চিত হওয়ায় সুশোভিত হলো, বল্গা মোচনে ধাবিত হলো এবং শ্রমবশতঃ রক্ত বমন করতে লাগল।

যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, মারুতি ক্রুদ্ধ হয়ে তালবৃক্ষের দ্বারা অকম্পনকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। বর্তমানে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আধুনিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার দেখলেও তখন যুদ্ধে প্রকৃতি থেকে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা হতো। বানরসেনা নীলকে দেখতে পাই প্রহস্তের উপর বিশাল বৃক্ষ নিক্ষেপ করতে। কখনো বা বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের উপর শিলা নিক্ষেপ করতে।

শুভ-অশুভ লক্ষণ তারা প্রকৃতি থেকেই বোঝার চেষ্টা করত। দশরথের মৃত্যু সংবাদ ভরতকে না দেওয়া হলেও তিনি অযোধ্যা ফেরার পথে গুরুজনের মৃত্যু আশঙ্কা করলেন। ভট্টিকাব্যে বলা হয়েছে–

বন্ধূনশঙ্কিষ্ট সমাকুলত্বা-
দাসেদুষঃ স্নেহবশাদপায়ম্।
গোমায়ুশা রঙ্গগণাশ্চ সম্যঙ্-
নায়াসিষুর্ভীমমরাসিষুশ্চ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৩/২৬

- দুঃস্বপ্ন দেখে এবং দূতের আগমনে স্নেহবশত বিহ্বল ভরত গুরুজনের মৃত্যু আশঙ্কা করতে লাগলেন। যাওয়ার পথে শৃগাল ও হরিণগণ প্রতিকূলে যেতে যেতে অমঙ্গলসূচক ভয়ানক শব্দ করতে লাগল।

প্রকৃতির বিরূপ বা রুদ্র রূপ থেকে তারা অশুভ সংবাদের সংকেত পেয়েছে।

রামচন্দ্র মারীচকে বধ করে আসার পথে শৃগালের উচ্চস্বরে ভীষণ চিৎকার শুনে বুঝতে পারলেন, সীতার কোনো ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ যখন যুদ্ধে যাত্রা করল তার যাত্রাপথে অশুভ লক্ষণ দেখতে পান। মনে হচ্ছিল পৃথিবী যেন ভয় পেয়ে নুয়ে পড়েছে, গাছ পড়ে যাচ্ছে, সিংহ ভয়ে ছুটছে। অলুক্ষণে শিয়াল ডাকছে, জ্বলন্ত উল্কা এসে পড়ছে। দশানন রাবণের যে সামনে বিপদ তাও পরিবেশ থেকে পাওয়া যায়। ইন্দ্রপুরোহিত বৃহস্পতিকে দিনেও দেখা যাচ্ছে। উল্কাপতন হচ্ছে তাতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হচ্ছে, মাংসাশী শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ ভীষণ শব্দ করছে, স্থূলস্তনী গাভী থেকেও অল্প, বিবর্ণ, বিরস দুধ দোহন হচ্ছে, প্রচুর ইন্ধনযোগেও অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে না, যা সবই অশুভ অমঙ্গলজনক।

ত্রয়োদশ সর্গের সেতুবন্ধন অংশে আমরা প্রকৃতির স্নিগ্ধ শান্ত এবং রুদ্র বা ভংয়কর রূপ একই সঙ্গে দেখতে পাই–

অবগাঢ়ং গিরিজালং ভুঙ্গমহাভিত্তিরুদ্ধসুরসঞ্চারম্
অভয়হরিরাসভীমং করিপরিমলচারু বহলকন্দরসলিলম্ ॥
অলিগণবিলোলকুসুমং সমলজলমত্তকুররকাণ্ডবগণম্ ।
ফণিসঙ্কুলভীমগুহং করিদন্তসমূঢ়সরবসুধাখণ্ডম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১৩/ ১৭-১৮

– বানরেরা গিরিসমূহ উৎপাটিত করার জন্য এখানে এল; ঐ সকল পর্বতের বিশাল ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়, সেখানে দেবগণ সর্বদা বিচরণ করেন; তাদের তটভূমি নির্ভীক সিংহের গর্জনে ভয়ঙ্কর এবং গুহামধ্যস্থ জলহস্তীর মদগন্ধে মনোহর। সেখানে কুসুমরাশি ভ্রমরের দ্বারা আলোড়িত। কমলযুক্ত জল কুরর ও জলকুক্কুটগণের ক্রীড়াস্থল, সর্পসঙ্কুল বলে গুহাগুলি ভয়ঙ্কর এবং জলহস্তীর দন্তাঘাতে সিক্ত মৃত্তিকারাশি উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত।

চতুর্দশ সর্গে প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রার সময় প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করে-

তং যান্তং দুদ্রুবুর্গৃধ্রাঃ ক্রব্যাদশ্চ সিষেবিরে।
আববূর্বায়বো ঘোরাঃ খাদুল্কাশ্চ প্রচক্ষরুঃ ॥

সস্যন্দে শোণিতং ব্যোম রণাঙ্গানি প্রজজ্বলুঃ।
রথাঃ প্রচস্খলুঃ সাশ্বা ন ররংহাশ্বকুঞ্জরম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১৪/ ৯৭-৯৮

– যুদ্ধযাত্রায় গমনরত প্রহস্তের পিছনে গাধার দল চলল, মাংসাশী পশুরা বিচরণ করতে লাগল। চারদিকে শো শো শব্দে বায়ু প্রবাহিত হলো, আকাশ থেকে উল্কাপতন হতে লাগল। আকাশ রক্ত বর্ষণ করল, যুদ্ধাস্ত্রগুলি শাণিত হলো, অশ্বসহ রথ স্খলিত হলো, অশ্ব হাতিরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল।

এছাড়াও ভূমি বিদীর্ণ হয়ে, বানরসেনাদের কোলাহলে, হাতি অশ্বদের রক্ত বমনের কারণে চারদিকের পরিবেশ এক রুদ্রমূর্তি ধারণ করল।

যুদ্ধ যাত্রার সময় কুম্ভকর্ণের বর্ণনায়ও রুদ্ররূপের প্রকাশ ঘটেছে-

দগ্ধশৈল ইবাভাসীৎ প্রাক্তংস্ত ক্ষয়মেঘবৎ।
প্রাচকম্পদুদন্বন্তং রাক্ষসানপ্যতিত্রসৎ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১৫/২৩

– দগ্ধপর্বতের মতো মনে হলো কুম্ভকর্ণকে। প্রলয়কালীন মেঘের মতো গমন করল; সাগরকে প্রকম্পিত করল এবং রাক্ষসদেরও আতঙ্কিত করে তুলল।

এছাড়াও তাঁর যুদ্ধযাত্রায় প্রকৃতিও অশান্তরূপ ধারণ করে। আকাশ রক্ত বর্ষণ করে, প্রলয়কারী বায়ু প্রবাহিত হয়, জ্বলন্ত উল্কা এসে পড়ে।

মহাকবি ভর্তৃহরি (প্রাকৃতে ভট্টি। ভর্তৃ > ভট্টি) অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি জানতেন, ব্যাকরণ না জানলে ভাষার ওপর দৃঢ় অধিকার জন্মায় না এবং সাহিত্যপাঠে অর্থোদ্ধার সহজ হয় না। এজন্য তিনি নীরস ব্যাকরণ পাঠকে সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে সরস করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ সেই বহুল আলোচিত রোগ- নিরাময়ে তিক্ত ঔষধের জায়গায় মিষ্ট ঔষধের ব্যবহার। কাজটি দুরূহ। কিন্তু ব্যর্থ হননি কবি। তিনি ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র (প্রকীর্ণ কাণ্ড) ব্যবহার করেছেন প্রথম সর্গ থেকে পঞ্চম সর্গের ছিয়ানব্বই সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত; প্রধান সূত্র (অধিকার কাণ্ড) ব্যবহার করেছেন পঞ্চম সর্গের সাতানব্বই সংখ্যক শ্লোক থেকে সম্পূর্ণ নবম সর্গ পর্যন্ত। দশম থেকে একাদশ সর্গে (প্রসন্ন কাণ্ড) আছে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ব্যবহার, রচনার মাধুর্য, ভাবিকত্ব এবং ভাষাসমাবেশ। চতুর্দশ থেকে একবিংশ সর্গ পর্যন্ত আছে তিঙন্ত প্রক্রিয়া (তিঙন্ত কাণ্ড)। দ্বাবিংশ সর্গ শেষ হয়েছে লুট্ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এবংবিধ ব্যাকরণের কথা বললে সাধারণ পাঠকের কাছে ভট্টিকাব্য প্রবেশে একটা ব্যাকরণভীতি জাগ্রত হতে পারে। কিন্তু এ ভীতি সম্পূর্ণ অমূলক। ভট্টিকাব্যে কবির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার ঈর্ষণীয় সম্মিলন ঘটেছে। সহৃদয় ও বোদ্ধা পাঠকের কাছে ভট্টিকাব্য আনন্দপাঠ ও আকর্ষণীয় পাঠ হিসেবে গ্রহণীয়। এর প্রতিটি শ্লোকেই আছে চমৎকারিত্ব। এখন যাঁরা ব্যাকরণের দিক থেকে পাঠ গ্রহণ করতে চান, তাঁরা নিঃসন্দেহে কাব্যরসের স্বাদ নিতে নিতে ব্যাকরণের আস্বাদন পাবেন। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন।

এখানে প্রয়াসী হয়েছি, ভট্টিকাব্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের রূপ দেখতে- প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষণ। 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যং' হবে, আর সেখানে প্রকৃতি থাকবে না, প্রকৃতি তার রূপের অপরূপত্ব নিয়ে আসবে না, তাই কি হয়? ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্যে প্রকৃতির যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। রসগ্রাহী দ্রষ্টা পাঠক এই প্রকৃতিকে দেখে অনুভব করে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। স্বল্প পরিসরে সুনির্দিষ্ট কিছু শ্লোক উদ্ধার করে চেষ্টা করেছি ভট্টিকাব্যের প্রকৃতিকে দেখাতে।

আলোচনায়-বিশ্লেষণে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব-মানবীর আত্মপ্রকৃতির পরিবর্তন। বাল্মীকির রামায়ণে এবং রামায়ণাশ্রিত ভট্টিকাব্যের প্রকৃতির রূপ আমরা এখন দেখবে পাব না। এর কারণও আমাদের জানা। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে-স্বার্থের লোভে মানুষ প্রকৃতিকে হনন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। প্রাচীন কাব্যপাঠে আমরা সম্বিৎ ফিরে পেতে পারি, প্রকৃতির সংরক্ষণে আমরা সচেষ্ট হতে পারি। যতটুকু আছে তাকে আর বিপর্যস্ত না করে আমরা সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। ভট্টিকাব্যের প্রকৃতিপাঠের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ জড়জগতের যে বৈচিত্র্য অবলোকন করি, যে মুগ্ধতা আমরা অনুভব করি এ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সেই অনুভূতিকে জাগ্রত করতে চাই বর্তমান সময়েও। এ আশাবাদ নিশ্চয়ই অতিরিক্ত কিছু নয়। সকল সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা ভট্টিকাব্যসহ প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করব। আমরা আমাদের প্রকৃতিকে বাঁচাব। আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করব, অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করব। আমরা সজীব হব। সানন্দ হবে আমাদের বেঁচে থাকা।

তথ্যসূত্র

১ ভর্তৃহরি, ভট্টিকাব্যম্‌, প্রসূন বসু (সম্পাদিত), সাহিত্যসম্ভার-৪, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-১৯৭৮

২ ভর্তৃহরি, ভট্টিকাব্যম্‌, ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীমদ্‌গুরুনাথবিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য্যেণ সম্পাদিত), সংস্কৃতপুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৬

৩ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলকাতা